সুকুমার রায়-এর

জীবজন্তু

সুকুমার রায়-এর

জীবজন্তু

বই পরিকল্পনায় : গ্রন্থিক প্রকাশন
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া (প্রিন্টিং প্যাকেজার)

গ্রন্থিক
প্র কা শ ন

গরিলা

গরিলা থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে। গাছের ডালপালার ছায়ায় সে জঙ্গল দিনদুপুরেও অন্ধকার হয়ে থাকে; সেখানে ভাল করে বাতাস চলে না, জীবজন্তুর সাড়াশব্দ নাই। পাখির গান হয়ত ক্বচিৎ কখন শোনা যায়। তারই মধ্যে গাছের ডালে বা গাছের তলায় লতাপাতার মাচা বেঁধে গরিলা ফলমূল খেয়ে দিন কাটায়। সে দেশের লোকে পারতপক্ষে সে জঙ্গলে ঢোকে না— কারণ গরিলার মেজাজের ত ঠিক নেই, সে যদি একবার ক্ষেপে দাঁড়ায়, তবে বাঘ ভালুক হাতি তার কাছে কেউই লাগে না। বড় বড় শিকারী, সিংহ বা গন্ডার ধরা যাদের ব্যবসা, তারা পর্যন্ত গরিলার নাম শুনেলে এগোতে চায় না।

পৃথিবীর প্রায় সবরকম জানোয়ারকেই মানুষে ধরে খাঁচায় পুরে চিড়িয়াখানায় আটকাতে পেরেছে—কিন্তু এ পর্যন্ত কোন বড় গরিলাকে মানুষে ধরতে পারেনি। মাঝে মাঝে দুটো একটা গরিলার ছানা ধরা পড়েছে কিন্তু তার কোনটাই বেশি দিন বাঁচেনি।

একবার এক সাহেব একটা গরিলার ছানা পুষবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটার বয়স ছিল দু-তিন বৎসর মাত্র। তিনি বলেন, তার চালচলন, মেজাজ, দুষ্টুমি বুদ্ধি ঠিক মানুষের খোকার মতো। তাকে যখন ধরে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হত, তখন সে মুখ বেজার করে পিছন ফিরে বসে থাকত। যে জিনিস সে খেতে চায় না সেই জিনিস যদি তাকে খাওয়াতে যাও, তবে সে চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে অনর্থ বাধিয়ে বসবে। একদিন তাকে জোর করে ওষুধ খাওয়াবার জন্য চারজন লোকের দরকার হয়েছিল। তাকে যখন জাহাজে করে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আনান হয়, তখন প্রায়ই জাহাজের উপর ছেড়ে দেওয়া হত কিন্তু সে কোনদিন কারো অনিষ্ট করেনি। তবে জাহাজের খাবার ঘরের পাশে যে একটা আলমারি ছিল, যার মধ্যে চিনি থাকত আর নানারকম মিষ্টি আচার ইত্যাদি রাখা হত সেই আলমারিটার উপর

তার ভারি লোভ ছিল। কিন্তু সে জানত যে ওটাতে হাত দেওয়া তার নিষেধ, কারণ দু-একবার ধরা পড়ে সে বেশ শাস্তি পেয়েছিল। তারপর থেকে যখন তার মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হত তখন সে কখনও সোজাসুজি আলমারির দিকে যেত না; প্রথমটা যেত ঠিক তার উল্টোদিকে, যেন কেউ কোনরকম সন্দেহ না করে! তারপর একটু আড়ালে গিয়েই এক দৌড়ে বারান্দা ঘুরে একেবারে আলমারির কাছে উপস্থিত!

একবার একটা গরিলার ছানাকে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল। চিড়িয়াখানায় নানারকম অদ্ভূত জন্তু দেখতে তার খুব মজা লাগত — কোন কোনটার খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে তাদের চালচলন দেখত। একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চা ছিল, সে নানারকম কসরৎ জানত — সে যখন ডিগবাজি খেয়ে বা হুটোপাটি করে নানারকম তামাসা দেখাত, গরিলাটা ভারি খুশী হয়ে তার কাছে এসে বসত।

গরিলার চেহারাটা মোটেও শান্তশিষ্ট গোছের নয় — মানুষের মতো লম্বা, চওড়ায় তার দ্বিগুণে, গায়ের জোর তার দশটার মতো — তার উপর সে যখন রাগের চোটে চিৎকার করে নিজের বুকে কিল মারতে মারতে এগোতে থাকে তখন তার সেই শব্দ আর মুখভঙ্গী আর রকমসকম দেখে খুব সাহসী লোক পর্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ দেখলেই গরিলা তেড়ে মারতে আসে না — বরং সে অনেকসময়ে মানুষকে এড়িয়েই চলতে চায়। কিন্তু তুমি একেবারে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হও ত সে কি করে বুঝতে পারে যে তোমার কোন দুষ্ট মতলব নাই ? বিশেষত লোকে যখন লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ করে জঙ্গলে হাজির হয়, তাতে যদি গরিলা খুশী না হয়, তবেই কি তাকে হিংস্র বলতে হবে ?...

গরিলার লড়াই

যতরকম বনমানুষ আছে তার মধ্যে, বুদ্ধিতে না হোক, শরীরের বলে গরিলাই সেরা। হাত–পায়ের মাংসপেশীর বাঁধন থেকে তার দাঁড়াবার ধরন আর ভ্রূকুটিভঙ্গি পর্যন্ত সবই যেন খাঁ খাঁ করে তেড়ে বলছে, “খবরদার ! কাছে এস না !”

মানুষের মধ্যে এত বড় পালোয়ান কেউ নেই যে এক মিনিটের জন্যেও একটা গরিলার রোখ সামলাতে পারে। কিন্তু গরিলায় গরিলায় যদি লড়াই লাগে, তাহলে সেটা দেখতে কেমন হয় ? বড় বড় পালোয়ান কুস্তিগীরের লড়াই দেখতে কত মানুষ পয়সা দিয়ে টিকিট কেনে; সে লড়াই যতই ভীষণ হয়, হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি যতই বেশি হয়, মানুষের ততই উৎসাহ বাড়ে। কিন্তু গরিলাদের মধ্যেও কি সেরকম লড়াই বা রেষা-রেষি লাগে ? লাগে বৈকি ! এমন গরিলা পাওয়া গিয়েছে যার দাঁত ভাঙা বা কানটা ছেঁড়া, অথবা গায়ে মাথায় অন্য গরিলার দাঁতের চিহ্ন রয়েছে লড়াইয়ের সময় কোন মানুষে উপস্থিত থেকে তা দেখেছে, আজ পর্যন্ত এরকম শোনা যায়নি — কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম লড়াই যে হয়, নানারকম গর্জন আর হুংকার আর বুক চাপড়াবার গুম্ গুম্ শব্দে অনেক সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। গরিলা যখন ক্ষেপে, তখন রাগে সে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর আপনার বুকে দমাদম্ কিল মারতে থাকে। তার চোখ দুটো তখন আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে, তার কপালের লোম ফুলে ফুলে খাড়া হয়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে নাকের ফস ফস আর দাঁতের কড়মড় শব্দ চলতে থাকে । তার উপর সে যখন হুংকার ছাড়ে, তখন অতিবড় সাহসী জন্তুও পালাবার পথ খুঁজিতে চায়। লোকে বলে, সে হুংকার নাকি সিংহের ডাকের চাইতেও ভয়ানক।

মনে কর, জঙ্গলের মধ্যে কোন গরিলাসুন্দরীর বিয়ের জন্য দুই মহাবীর পাত্র এসেছেন। দুজনেই তাকে ভালোবাসে, দুজনেই তাকে চায়, কেউ দাবি

ছাড়তে রাজী নয়। এমন অবস্থায় পশু পাখির মধ্যে সর্বত্রই যা হয়ে থাকে, আর পুরাণের বড় বড় স্বয়ংবর সভাতেও যেমন হয়ে এসেছে, এখানেও ঠিক তাই হওয়াই স্বাভাবিক। তখন দুই বীর আপন আপন তেজ দেখিয়ে লড়াই করতে লেগে যায়। সে ভীষণ লড়াই যে একটা দেখবার মতো ব্যাপার তাতে আর সন্দেহ কি? গরিলার চড় আর গরিলার ঘুঁষি, যার একটি মারলে মানুষের ভুঁড়ি ফেঁসে যায় মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়ে যায়, সে কেবল গরিলার গায়েই সয়। সেই চটপট দুমদুম কিল চড়ের সঙ্গে খামচা খামচি আর কামড়া-কামড়িও নিশ্চয়ই চলে। এইরকমে যতক্ষণ না লড়াইয়ের মীমাংসা হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ এক পক্ষ হার মেনে চম্পট না দেয়, ততক্ষণ হয়ত গরিলাসুন্দরীর চোখের সামনেই এই ভীষণ কাণ্ড চলতে থাকে। সে বেচারা হয়ত চুপ করে তামাসা দেখে, কিংবা দুজনের মধ্যে কাউকে যদি তার বেশি পছন্দ হয়, তবে তার পক্ষ হয়ে লড়াইয়ে একটু আধটু যোগ দেওয়াও তার কিছু আশ্চর্য নয়।

বেবুন

যেসব বানরের মুখ কুকুরের মতো লম্বাটে, যারা চার পায়ে চলে, যাদের ল্যাজ বেঁটে আর গালের মধ্যে থলি আর পিছনের দিকটায় কাঁচা মাংসের মতো টিপি, তাদের নাম বেবুন। বেবুনের আসল বাড়ি আফ্রিকায়, কেউ কেউ এশিয়াতেও থাকেন। বেবুন বংশের অনেক শাখা—হলদে বেবুন, লালমুখো বেবুন, ঝুঁটিওয়ালা কালো বেবুন, চিত্রমুখ সংবেদন বা ম্যানড্রিল, চাকমা বেবুন, ড্রিল বেবুন ইত্যাদি। কিন্তু সকলেরই মুখের ভঙ্গী চালচলন ও স্বভাব প্রায় একইরকম। উঁচু উঁচু ধারাল দাঁত, বদখত মেজাজ আর তার চাইতেও বদখত চেহারা। সমস্ত জানোয়ারদের মধ্যে বিদঘুটে চেহারা যদি কারও থাকে তবে সে ঐ ম্যানড্রিলের। টকটকে লাল নাক, খাঁজকাটা নীল গাল, ভেংচিকাটা ভ্রূকুটি মুখ, সব মিলে অপূর্ব চেহারাখানা হয়!

আফ্রিকার পাহাড়ে জঙ্গলে বেবুনেরা দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে। 'বল, বুদ্ধি, ভরসা' এই তিন জিনিসের জোরে সে নীচের জমিতে নেমে এসে চাষার ক্ষেতের উপর অত্যাচার করে ফল শস্য খেয়ে পালায়। তাদের দল বাঁধবার কায়দা, আর পথঘাট পাহারা দেবার ব্যবস্থা এমন চমৎকার, আর এমন হঠাৎ এসে লুটপাট করে তারা ফস্ করে পালায় যে, চাষারা তাদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে না। পালাবার সময় বেবুনেরা কখনও দলের কাউকে ফেলে যায় না—যদি একজন বিপদে পড়ে অমনি পালের গোদারা তাকে সাহায্য করবার জন্য তেড়ে আসে। একবার একটা বাচ্চা বেবুনকে কতগুলো কুকুরে ঘেরাও করে ফেলেছিল, কিন্তু একটা ধাড়ি বেবুন এসে সেই কুকুরের দলের মধ্যে ঢুকে, এমনি দু-তিন ভেংচি দিয়ে তাদের মুখের সামনে থেকেই সেই বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে গেল যে, কুকুরগুলো ভয়ে কিছুই করতে সাহস পেল না—দূরে শিকারীরা পর্যন্ত তার তেজ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বিপদে পড়লে বেবুনেরা পিছনের পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে বসে—শত্রুকে হাতের কাছে পেলেই নখ দিয়ে খামচে টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসে, তার পরেই প্রচণ্ড এক কামড়। কামড়ের জোরে হাড়গোড় পর্যন্ত অনায়াসেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। নখ দাঁতই হচ্ছে বেবুনের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু দরকার হলে তারা পাথর ছুঁড়তেও জানে। বড় বড় পাথর গড়িয়ে শত্রুর মাথায় ফেলতে তারা খুব ওস্তাদ।

আলিপুরের বাগানে

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আমাদের একটি বন্ধু আছেন। আমরা যখনই আলিপুরে যাই অন্তত একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুলি না। দেখা করবার সময় শুধু হাতে যাওয়াটা ভাল নয়, তাই বন্ধুর জন্য প্রায়ই কিছু উপহার নিয়ে যাই। তিনিও তাঁর সাধ্যমত নানারকম তামাসা কসরত ও মুখভঙ্গী দেখিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করেন।

অনেকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে গোড়া থেকেই বাঘের ঘরটা দেখবার জন্য ব্যস্ত হন। সাপ, কুমির, উটপাখি, গণ্ডার আর হিপোপটেমাস—কেউ কেউ এঁদেরও খুব খাতির করে থাকেন। কিন্তু যে যাই বল, বাগানে ঢুকতে না ঢুকতেই আমাদের মনটা সকলের আগে বলতে থাকে, বন্ধুর বাড়ি চল, বন্ধুর বাড়ি চল। বন্ধুর সঙ্গে কেন যে আমাদের এত ভাব, তা যদি শুনতে চাও, তাহলে তাঁর নামের পরিচয়, গুণের পরিচয়, বিদ্যার পরিচয়, সব তোমাদের শুনতে হয়।

বন্ধুটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত ওরাংচন্দ্র ওটান। আফ্রিকা নিবাসী, আলিপুরে প্রবাসী। অমন অমায়িক চেহারা, অমন ঢিলাঢালা প্রশান্ত স্বভাব অমন ধীর গম্ভীর মেজাজী চাল, সমস্ত আলিপুর খুঁজে আর কোথাও দেখবে না।

কত যে ভাবনা আর কত যে হিসাবপত্র সর্বদা তাঁর মাথার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে তাঁর ঐ প্রকাণ্ড কপালজোড়া হিজিবিজি রেখাগুলো দেখলেই তা বুঝতে পারবে। যখন তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে, পেট চুলকাতে থাকেন, আর তাঁর কালো কালো হ্যাংলা মতন চোখ-দুটি মিটমিট করে তাকিয়ে থাকে, তখন যদি তাঁর মনের মধ্যে কান পেতে শুনতে পারতে, তাহলে শুনতে সেখানে অনর্গল হিসাব চলছে—‘আর চারটে কলা, আর দু ঠোঙা বাদাম, আর কতগুলো বিস্কুট, আর ঐ নাম-জানি-না গোল-গোল-মতন অনেকখানি’—ইত্যাদি। যখন তিনি খাঁচার ছাত থেকে গরাদ

ধরে অত্যন্ত ভালমানুষের মতো ঝুলতে থাকেন আর দুলতে থাকেন—যেন সংসারের কোন কিছুতে তাঁর মন নেই—তখন যদি তাঁর মনের কথা শুনতে, তাহলে শুনতে পেতে, তিনি কেবলই ভাবছেন, কেবলই ভাবছেন 'এই লোকটার পাগড়ি না হয় ঐ লোকটার চাদর, না হয় এই সাহেবটার টুপি, না হয় ঐ বাবুটার ছাতা—নেবই নেব, নেবই নেব।'

একদিন আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি, ওরাংবাবু দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছেন। কোত্থেকে কি করে, কার একটা পাগড়ি তিনি আদায় করেছেন, আর সেইটাকে ছাতের গরাদের উপর থেকে ঝুলিয়ে অপূর্ব দোলনা তৈরি হয়েছে। তিনি দুহাতে তার দুই মাথায় ধরে মনের আনন্দে দুলছেন। তাঁর মুখখানা যেন সদানন্দ শিশুর মতো, নিজের বাহাদুরি দেখে নিজেই অবাক।

হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হল, পাগড়ির একটা দিক ছেড়ে দিয়ে তিনি গেলেন মাথা চুলকোতে। অমনি পাগড়ির একটা মাথা ভারি হয়ে নেমে পড়ল, আর আরেক মাথা আলগা পেয়ে সুড়ুৎ করে গরাদের উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল। ব্যাপারখানা বুঝবার আগেই ওরাংবাবু মেঝের উপর চিৎপাত। আর কেউ হলে অপ্রস্তুত হত, কিন্তু বন্ধু আমাদের অপ্রস্তুত হবার পাত্রই নন। তিনি পড়েই একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলেন আর এমনভাবে ফিরে দাঁড়ালেন যেন আগাগোড়া তিনি ইচ্ছা করেই আমাদের তামাসা দেখাচ্ছিলেন। তারপর অনেক-খানি ভেবে আর অনেক বুদ্ধি খরচ করে আবার তিনি দোলনা খাটালেন। কাপড়টাকে গরাদের উপর দিয়ে গলিয়ে তার দুটো মাথাকেই যে ধরে রাখতে হয়, এটা বুঝতে তাঁর কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। তিনি পাগড়িটাকে ঝুলিয়ে এক মাথা ধরে টানেন, আর হুস্ করে দোলনা খুলে আসে, তাতে প্রথমটা বেচারার ভারি ভাবনা হয়েছিল।

আমাদের বন্ধুটির নানারকম বিদ্যা আছে। তিনি পান খেতে ভারি ভালোবাসেন। পানটা হাতে দিলে, আগে সেটাকে খুলে পরীক্ষা করে দেখেন, তারপর হাতের মুঠোর মধ্যে মুড়ে টপ করে মুখের মধ্যে দিয়ে ফেলেন। যখন পান খেয়ে তাঁর মুখখানা লাল হয়, আর গাল বেয়ে পানের রস পড়তে থাকে, তখন তিনি মাটির মধ্যে থুতু ফেলেন, আর লাল রঙের থুতু দেখে খুশী হয়ে তাকিয়ে থাকেন। একদিন গিয়ে দেখি, তিনি জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে অত্যন্ত লাজুক ছেলের মতো চুপচাপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখে তাঁর কি খেয়াল হল জানি না, তিনি ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললেন।

শুনেছি, তিনি নাকি লুকিয়ে সিগারেট খেতেও শিখেছেন, আর সুযোগ পেলে মালীদের হুঁকোতেও দু-এক টান দিতে ছাড়েন না।

বন্ধু গানবাজনার সমজদার কিনা, অথবা 'সন্দেশ' পড়তে পারেন কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাইনি, কিন্তু তিনি যে সুগন্ধ জিনিসের কদর বোঝেন, তার পরিচয় অনেক পেয়েছি। তুলোয় করে খানিকটা এসেন্স দিয়ে দেখেছি, সেই তুলোটুকু নাকে ঠেকিয়ে শুঁকতে শুঁকতে আরামে তাঁর দুই চোখ বুজে আসে, জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে, তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ শুঁকে শুঁকে তারপর তুলোটাকে যত্ন করে তুলে রেখে দেন, আর থেকে থেকে ফিরে এসে তার গন্ধ শোঁকেন। একবার আমরা তামাসা দেখবার জন্য তুলোয় করে খানিকটা ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়া দিয়েছিলাম। সেটাকে শুঁকে যেরকম অদ্ভূত চোখমুখের ভঙ্গী তিনি করেছিলেন, আর যেরকম করে বারবার হাতে আর রেলিঙে নাক ঘষেছিলেন, সে কথা মনে হলে আজও আমাদের হাসি পায়। একবার শুঁকেও তাঁর কৌতূহল মেটেনি খুব সাবধানে দূর থেকে আরও দু-চারবার তুলোটাকে শুঁকে, আর দু-চারবার চমৎকার মুখভঙ্গি করে, তিনি সেটাকে তাঁর প্রতিবেশী এক বেবুনের ঘরের মধ্যে ফেলে দিলেন। সেই হতভাগা বেবুনটাও কথা নেই বার্তা নেই, তুলোটকু নিয়েই ঝপ করে মুখ দিয়ে ফেলেছে। তারপর যদি তার দূরবস্থা দেখতে ! অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাক রগড়িয়ে হাঁচতে হাঁচতে, আর হাঁ করে জিভের জল ফেলতে ফেলতে বেচারা অস্থির।

এই বেবুনটার সঙ্গে ওরাং ওটানের একটুও ভাব নেই। আরেকবার ওরাং আমাদের কাছ থেকে একটা লাঠি আদায় করেছিলেন। লাঠিটা পেয়েই তিনি ব্যস্তভাবে বাইরে গিয়ে, রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাঁর নিশ্চিন্ত প্রতিবেশীর ঘাড়ের উপর এক খোঁচা। তখন যদি বেবুনের রাগ দেখতে! আমরা সেবার দুই খাঁচার মাঝখানে কলা গুঁজে দিয়ে, বেবুন আর ওরাঙের ঝগড়া দেখেছিলাম। বোকা বেবুনটা যতক্ষণে আঁচড় কামড় আর কিল ঘুঁষি চালাতে থাকে, ততক্ষণে ওরাংবাবু গম্ভীরভাবে ঘাড় গুঁজে কলাটুকু বার করে নেন। কলাটি নিয়ে মুখে দিয়ে তারপরে তাঁর উল্লাস আর ভেংচি। বেবুনটা রাগে যতই পাগলের মতো হয়ে উঠতে থাকে, বন্ধুর ততই ফুর্তি বাড়ে।

এসব কথা কিন্তু চুপিচুপি খালি তোমাদের কাছেই বললাম। তোমরা আলিপুরের কর্তাদের কাছে কক্ষনো এসব বল না; তাহলে আমাদের বাগানে যাওয়া মুশকিল হবে।

মানুষ মুখো

বাঁদরের মুখের চেহারা যে অনেকটা মানুষের মতো তা দেখলেই বোঝা যায়; বিশেষত ওরাং ওটান শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বুদ্ধিমান বাঁদরদের চালচলন আর মুখের ভাব দেখলে মানুষের মতো আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন বাঁদর আছে তাদের মাথার লোমগুলি দেখলে ঠিক টেরিকাটা মানুষের মাথার মতো মনে হয়, যেন কেউ চিরুনি দিয়ে চুল ফিরিয়ে সিঁথি কেটে দিয়েছে। এক ধরনের বাঁদরের যেরকম গোঁফের বাহার খুব কম মানুষেরই সেরকম আছে। এর বাড়ি আমেরিকায়। ছোট্ট আধ হাত উঁচু বাঁদরটি, কিন্তু ওই গোঁফের জন্যে তার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ভাব দেখা যায়। এদের রং কাল, হাতে লম্বা লম্বা নখ থাকে, তাই দিয়ে কাঠবেড়ালীর মতো গাছে খাম্‌চিয়ে ওঠে। এই জাতীয় বাঁদরের নাম টামারিন। এদের সকলের এরকম গোঁফ থাকে না; গুঁফো বাঁদরদের এম্পারার টামারিন অর্থাৎ সম্রাট টামারিন বলে। তা সম্রাটের মতো চেহারাই বটে। সম্রাটের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কলা। গুঁফো বাঁদরের পর দাড়িওয়ালা বাঁদর, তার নাম হচ্ছে কাল সাকী। এরও বাড়ি আমেরিকায়। সে দেশের লোকেরা এই বাঁদরকে শয়তান বাঁদর বলে। এরকম অন্যায় নাম দেবার কোনই কারণ পাওয়া যায় না, কারণ এদের মেজাজ যেমন ঠাণ্ডা, স্বভাবও তেমনি নিরীহ। দাড়ির বহর যতই হোক না কেন, আসলে এরা ভীতুর একশেষ। মানুষের কোন অনিষ্ট করা দূরে থাক, কাছে কোথাও মানুষ আছে জানতে পারলে এরা তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালায়। এদের কোনরকমে পোষ মানান যায় না; ধরে আনলে অতি অল্প দিনের মধ্যে মরে যায়। আর এক জাতের সাকী বাঁদর রয়েছে। এর গায়ের রং খুব হালকা তাই একে সাদা সাকী বলা হয়। এর চেহারা যেন আরো উদ্ভট গোছের। দাড়িও অন্য রকমের। এইরকমের গালপাট্টা দেওয়া চেহারা আর বিকট ধেবড়ান মুখ দেখে বুঝবার যো নেই যে, বেচারার স্বভাবটি মোটেও তার চেহারার মতো নয়।

বুড়ো-ধাড়ী সিন্ধুঘোটকদের চেহারাও অনেক সময় খুব মাতব্বর গোছের মানুষের মতো মনে হয়। গোঁফ দাড়ি, মাথায় টাক, সবই বেশ মানিয়ে যায়, কেবল হাতির মতো ওই প্রকাণ্ড দাঁত দুটোতেই সব মাটি করে দেয়।...